International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন : শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফিরে দেখা বর্তমানের চোখে

সুদীপ হাজরা

(প্রাক্তন ছাত্র) ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ :
উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে বাঙ্গালি মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই নগণ্য। ফলে নবজাগরণের প্রকৃত সুফল পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ১৯২০-র দশক পর্যন্ত। ১৯২৬ সালে জানুয়ারি মাসে 'মুসলিম সাহিত্য পরিষদ' গঠনের মধ্য দিয়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার শুরু করেছিলো। এখান থেকেই বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের প্রকৃত নবজাগরণ শুরু হয়েছিলো। ঢাকাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কাজী আব্দুল ওদুদ,কাজী নজরুল ইসলাম,কাজী মোতাহার হোসেন,মহম্মদ শহীদুল্লা,আবুল ফজল প্রমুখের চেষ্টায় বাঙ্গালী মুসলমান ধর্মান্ধতা,অশিক্ষা এবং কুসংস্কার দূর করে ধর্মনিরপেক্ষ,যুক্তিবাদি,ইহজাগতিক মানবতাবাদের যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও তার পরবর্তী ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এই আন্দোলনের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও বাঙ্গালি মুসলমানেরা বলিষ্ট আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন তার প্রবাহ হারাতে শুরু করেছিল। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে ঐতিহ্য পর্যালোচনা করা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে সেই ঐতিহ্যকেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : নবজাগরণ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ভাষা আন্দোলন, অপারেশন সার্চলাইট, মুক্তিযুদ্ধ,গনহত্যা,উন্মাহ।

'আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই।এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের সূচনা হয় যা বাংলার রেনেসাঁস নামে পরিচিত।'[১] উনিশ শতকের বাংলার এই নবজাগরনে হিন্দু বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালিরা বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনরায় , বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছিলেন এই নবজাগরণের অগ্রদূত। ফলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের একটা বড়ো অংশ এর সুফল পেয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান সমাজে এবিষয়ে তেমন উৎসাহ ছিলোনা। মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কতিপয় বাঙালী মুসলমান যথা আব্দুল লতিফ,আমীর আলী প্রমুখ যারা মুসলমানদের উন্নতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ তখনও প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজ আধুনিক মনস্কতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজস্ব সমাজ ও শরীয়তের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন।[২] ফলে নবজাগরণের প্রকৃত সুফল পেতে প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজকে ১৯২০-র দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'মুসলিম সাহিত্য পরিষদ' গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের বহু কাঙ্ক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান চর্চার প্রকৃত পরিসর তৈরি হয়েছিল। এই আন্দোলনের মুখপত্র ছিল 'শিখা' যার

প্রথম পাতায় লেখা থাকত 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ,বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট,মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' ঢাকা শহর ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।[৩] কাজী নজরুল ইসলাম,কাজি মোতাহার হোশেন,কাজী আব্দুল ওদুদ,আব্দুল কাদির,আবুল ফজল,মহম্মদ শহীদুল্লা প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ। যাদের চিন্তাভাবনা ছিল মূলত যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির। যাদের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তি ও জ্ঞানের রাজ্যে আহ্বান করা।

এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা আবুল হোসেন তার একাধিক প্রবন্ধে বলেন যে কালের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে সত্যকে জানতে হবে। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জানা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে জানার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তিনি গোঁড়ামি পরিহার করে যুগের আলোকে সত্যের পক্ষে মতপ্রকাশের দাবি জানান। এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ কাজী মোতাহার হোসেন যিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে মুসলিম পরিবারের সংগীতাদি ললিতকলা চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ছাড়া সমাজ মানসের উন্নতি সাধিত হয় না। যদিও 'শিখা' গোষ্ঠীর এসব বক্তব্য তৎকালীন রক্ষনশীল সমাজ সুনজরে দেখেনি।[৪] তবুও বলা যেতে পারে মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার যাত্রা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকেই।তাই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রকৃত নবজাগরণের স্বরুপ।

কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর সর্বভারতীয় রাজনীতি জটিল আকার ধারণ করে। দ্বি-জাতি ত্বতের ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ফলে এ আন্দোলনে ভাটা পড়তে থাকে।এরপর ১৯৪০সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের সংখ্যালঘু থেকে জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। জিন্না হয়ে ওঠেন মুসলিম লীগের 'একমাত্র মুখপাত্র'।[৫] ১৯৪০ খ্রিঃ মার্চের এই লাহোর অধিবেশনে দেশ ভাগের কথা সরাসরি না বলা হলেও অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলি নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।[৬] ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রুপ নেয়। যে রক্ত স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ হওয়ার কথা ছিল তা বিনষ্ট হতে থাকে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গায়। ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার ন্যায় একাধিক স্থানে দাঙ্গা ঘটতে থাকে। বহু মুসলমান পরিবার আত্মপরিচয়ের সংকটে নিজ ভূমি ছেড়ে ওপার বাংলায় পাড়ি দেয়।[৭] মজার কথা হলো এই সময় যে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার নির্ণায়ক ছিল ধর্ম। ফলে ধাক্কা খেল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রাপ্ত ধর্মনিরপেক্ষ বৌদ্ধিক চর্চা। বাস্তবিক অর্থে লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যে ক্ষীণ জাতিস্বত্তার ইঙ্গিত ছিল তা সমূলে বিনষ্ট করে বাঙালি জাতি স্বত্তার পথ রুদ্ধ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো।এর সাথে বাংলার একটা বড়ো অংশ জুড়ে গেল যেটা পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করলো।[৮]

যাইহোক দেশ ভাগের পর উল্লিখিত জ্ঞানচর্চা চোরা স্রোতে বইতে থাকল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভ্রম মানুষের মন থেকে দূর হতে থাকল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বুঝতে পারলো ধর্মরাজ্যের নামে যে তত্ব তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল উল্টে সেটাই তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দিকে নিয়ে গিয়েছে।ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেলেও তারা নতুন করে পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া শোষণ যন্ত্র তথা উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। যদিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পুনরায় বাঙ্গালী নব উদ্যমে জেগে ওঠে। ক্রমশ নবজাগ্রত বাঙালী জাতীয়তাবাদ,গণতন্ত্র ও সমাজবাদী ধারনার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়।[৯]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে অর্থনৈতিকসহ নানাবিধ বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। এসবের পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে এবার তারা নতুন করে তাদের

মাতৃভাষার প্রতি বঞ্চনার শিকারের দিকে যাচ্ছিল। যার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছিল ১৯৪৮সালে 'কায়েদ-এ-আজম' মহম্মদ আলী জিন্নার এক ভাষণে। যেখানে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন- 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে রাতারাতি পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিট থেকে বাংলাভাষাকে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হলো।[১০] সঙ্গত কারণেই বাঙ্গালি সমাজ মনে করলেন সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতিকে কোথাও যেন দমিয়ে রেখে জোর করে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।ফলে মুলত ছাত্র সমাজের ডাকে ১৯৪৮ সালে শুরু হলো প্রতিবাদ মিছিল। যদিও ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন- ১৯৪৭ সালে 'গণ আজাদী লিগ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।গণআজাদি লিগের ঘোষনায় বলা হয়েছিল-"মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে.....বাংলা আমাদের মাতৃভাষা,বাংলা হইবে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[১১] ক্রমশ বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের ছাপ এখানেও লক্ষ্য করা গেল।১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকেই একাধিক মুসলমান লেখক যথা শহীদুল্লা, কাজি মোতাহার হোশেন,আবুল মন্সুর,আব্দুল হক প্রমুখ বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার কথা লিখতে শুরু করেছিলেন।[১২] তারা ভুলে গিয়েছিলেন উর্দু তাদের ভাতৃত্বের ভাষা। যদিও ভুললে চলবে না ১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলেন। তিনি বাংলার পাশাপাশি উর্দু ও ইংরেজিকেও সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেন।তার এই দাবীকে সমর্থন করেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।[১৩] পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল সেখানেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। শালাম,বরকত,রফিক জব্বারদের মতো নাম না জানা একাধিক ছাত্র সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।[১৪] যার পিছনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা কাজ করেছিল। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ইসলামীয় উম্মাহের ভাষা উর্দুর উদ্ধে স্থান পেয়েছিল মাতৃভাষার দাবী।

ধর্মকে কেন্দ্র করে যেখানে একাত্ম হওয়ার বিরাট হাতছানি ছিল তা একপ্রকার উপেক্ষা করেই বাঙালি মুসলমান সমাজ বাঙ্গালী জাতিসত্বা ও বাংলা ভাষাকেই বেছে নিয়েছিল।একসময় জিন্নার চূড়ান্ত সমর্থক মুজিবর রহমানও এসময় ভাষা আন্দোলনে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজ করে ছিলেন।যদিও তার ফলস্বরুপ তাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। তিনি জেলের মধ্যে থেকেই জনগণকে প্রভাবিত করার কাজ করছিলেন।তাঁর প্রায় প্রতিটা বক্তব্যে তিনি বলতেন- ' হিন্দু-মুসলমান বাঙালি ভাইয়েরা আমার...'।[১৫] একসময় ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের দাবীকে সমর্থন করা মুজিবর রহমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে এগোতে থাকেন। যার স্পষ্ট ছাপ মেলে যখন ১৯৫৫ সালের ২১ শে অক্টোবর 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম পরিবর্তন করে 'মুসলিম লীগ' করা হয়। যার সাধারণ সম্পাদক হন মুজিবর রহমান। এবার থেকে তাঁর বেশিরভাগ কর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছাপ মিলতে লাগল। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা থামাতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাঁর এক বক্তব্যতে বলেন – রবীন্দ্রনাথ,নজরুল,জীবনানন্দ বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালির প্রাণ শক্তি এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।[১৬] ফলে অল্পসময়েই তিনি বাঙালী জাতীর ত্রাতাতে পরিণত হলেন। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনকে পাথেয় করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধের সূচনা হয়েছিল তা ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পটভূমি রচনা করেছিল। এই সময় পর্বে অতএব ১৯৪৭-৭১ খ্রি. পর্যন্ত পূর্ব

পাকিস্তানের মানুষদের সংগ্রামের চেহারা ছিল মুলত অসাম্প্রদায়িক।যা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে অভিনব।কারণ ১৯৪৭ খ্রি. দেশভাগ ছিল মুলত সাম্প্রদায়িক বা ধর্মকেন্দ্রিক।[১৭]

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ২০ বছর ধরে পূর্ব বাংলাকে তথা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্মের মোহে ফেলে নানান ভাবে বঞ্চিত করে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমশ তারা তাদের মুক্তির দিন গুনছিল।কেবল একটা উপযুক্ত নেতার অভাবে এযাবৎ কাল বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক লাঞ্ছনা সহ্য করছিল।কিন্তু মুজিবর ও তাঁর আওয়ামী লীগ নতুন করে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখায়। ১৯৬৬ সালে ২০শে এপ্রিল ঢাকাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুজিবর ৬ দফা দাবী তোলেন যা পরবর্তীকালে বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ১১ দফায় রূপান্তরিত হয়।যা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর চক্ষুশূলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মুজিবকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হয়।কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও তাকে দমাতে পারেনি।যার ফলস্বরুপ দেখি ১৯৭০ সালের অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ নির্বাচনে বাঙালী জাতিয়তাবাদকে হাতিয়ার করে পূর্বে উল্লিখিত ছয়দফা দাবীকে সামনে রেখে মুজিব নির্বাচন লড়েন। পাশাপাশি তিনি যারা ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতির ময়দানে লড়াই করছিলেন তাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ফলে এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।[১৮] যদিও ইয়াহিয়া খান ও বেনজির ভুট্টো মুজিবকে চক্রান্ত করে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।যা বুঝতে পেরে অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিব মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন।[১৯]

ইয়াহিয়া খান ও ভূট্ট একাধিক চেষ্টা চালান মুজিব কে আটকানোর। সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রি. ১৫ই মার্চ এক ঘোষণা মারফত মুজিব পূর্ব বাংলার শাসনভার হাতে তুলে নেন। ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ও ‘বাংলাদেশ-বাংলাদেশ’ ধ্বনিতে সেদিন আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের উদ্যেগে কালচে সবুজ বর্ণের নতুন পতাকা পূর্ব বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে।সরকারি অফিস,আদালত,স্কুল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে এই পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা – ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ হয় বাংলাদেশের নতুন জাতীয় সংগীত।[২০] অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মুজিবের সাথে শেষ নিষ্ফলা বৈঠক করেন ইয়াহিয়া খান। যদিও পরিস্থিতি তখন হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। তাই সেই রাতেই ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে মেজর টিক্কা খান শুরু করেন ‘অপারেশন সার্চলাইট’।শুরু হয় ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে গণহত্যা।রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অসহায় বাঙালী সেদিন প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী খান সেনাদের মেশিন গানের বুলেটের সামনে। ঐতিহ্যপূর্ণ একাধিক স্মৃতি সৌধ ধ্বংস করা হয়েছিল। নীরবে ধর্ষিতা হয়েছিল সাত থেকে সত্তর বয়সি একাধিক বাঙালি নারী। প্রেত পুরীতে পরিণত হয়েছিল ঢাকা নগরী। সমস্ত বীভৎসতা অতিক্রম করে উল্লাসের সাথে হত্যা যজ্ঞের খেলায় মেতেছিল পাকিস্তানের জল্লাদ খানসেনারা। পরদিন ভোরে মুজিবকে কারারুদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘ নয়মাস এই বাঙালি নিধন যজ্ঞ চালায় খানসেনা ও রাজাকার বাহিনী।যদিও তাদের মোকাবিলা করতে মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। মুজিব জেলে থাকায় জিয়াউর রহমান এই মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম নেতৃত্বে পরিণত হোন।[২১] টানা নয়মাস যুদ্ধ চলার পর অবশেষে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সহায়তায় আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানী সেনারা,ফলে আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।[২২]

এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আদলেই সরকার পরিচালনা করছিলেন মুজিবর রহমান। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে সমস্ত উগ্র মৌলবাদী দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।বাংলাদেশকে তিনি সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দঃ এশিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রথম কোনও দেশ ছিল বাংলাদেশ যে ১৯৭৪ সালে তার সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে প্রথম স্থান দেয়। যেখানে ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীতে ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি স্থান পায়।[২৩] অতএব যারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন করেছিল তাদের চিন্তা মুজিবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু মজার বিষয় হল এসব দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তা ব্যক্তিরা চুপ করে বসে থাকেনি।তারা গোপনে মুজিব বিরোধী, মুক্তি আন্দোলন বিরোধী,চীনপন্থি ভারতবিদ্বেষী,পাকিস্তানপন্থী মুসলিমদের মগজ ধোলাই করতে থাকে। সিরাজুল আলম খান,আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখের নেতৃত্বে ও বামপন্থিদের মদতে 'জাসাদ'নামক মুজিব বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। যার ফলস্বরূপ মুজিবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়।যেখানে মুজিবকে ভারতের দালাল,ইসলাম বিরোধী সহ বিভিন্ন অপপ্রচার ও কুৎসা জনমানসে রটানো হয়,পরিকল্পনা করে সেনাবাহিনীর একাংশকেও মুজিব বিরোধী চক্রান্তে সামিল করা হয়।ফলস্বরুপ নিজদেশের মধ্যেই মুজিব বিরোধী এক চোরাস্রোত বইতে থাকে। যার প্রত্যক্ষ পরিণাম হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একাংশের প্রচেষ্টায় ধানমুন্ডির বাসভবনে উপস্থিত পরিবারের সকল সদস্যসহ মুজিবর রহমান কে নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়।[২৪]

এরপর সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের সাহায্যে সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।মুলত এই সময় থেকেই বাংলাদেশ ইসলামিকরনের দিকে হাঠতে থাকে। ১৯৭৬ সালের ১লা মে চিনাপন্থিদের এক সমাবেশে জিয়াউর রহমান বক্তব্য রাখেন।যেখানে তিনি অভিযোগ তোলেন মুজিবের আমলে সঠিকভাবে ধর্মচর্চা করা থেকে মানুষ কে বাঁধা দান করা হত।এই সমাবেশের দুইদিন পর সামরিক ক্ষমতা বলে পূর্বতন স্থগিত সংবিধানের ৩৮ নম্বর ধারাটি বাতিল করেন জিয়াউর।ফলে মুজিবের সময় হেফাজতে ইসলাম, জামাত সহ উগ্র মৌলবাদী যে দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তারা আবার রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করে।[২৫] এরপর শায়েম কে সরিয়ে ১৯৭৭ সালে ২১শে এপ্রিল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হোন।তিনি পুনরায় সংবিধানে সংশোধনী আনেন। যার শিরোনামের নীচে 'বিসমিল্লাহ রহমানই রহিম'এই আরবী শব্দগুচ্ছ প্রবেশ করানো হয়। পাশাপাশি 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এসব শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়।[২৬] এরপর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসীন হন।১৯৮৮ সালে ৭ই জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষনা করা হয়। যদিও এই সংশোধনীতে অন্যান্য ধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে বলে উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ায় ইসলাম ধর্মালম্বীদের 'কর্তৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] এরপর আর বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'ইসলাম' শব্দটিকে সরানো যায়নি।ফলে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদল ধরে রাখতে ব্যর্থ হল। ধাক্কা খেল কাজি নজরুল, মোতাহার হোশেন,আব্দুল ওদুদদের ঐতিহ্য,অস্বীকৃত হল বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন।ফলস্বরুপ ইসলামিক রাজনীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল।বলা ভালো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার জায়গায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল।ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান চর্চার স্থান দখল করতে থাকল ধর্মীয় কঠোরতা ও মৌলবাদ।[২৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে একটি স্বাধীন দেশ হওয়ার পরও বাংলাদেশ কেবলমাত্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে নিজের স্বত্বাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ধর্ম কেবল বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না বরং বাংলাদেশের নাগরিকদের

সামনে আত্মপরিচয়ের চ্যালেঞ্জ ও ছুঁড়ে দিচ্ছে। যে আত্মপরিচয়ের সংকট শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই।যেখানে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হিসেবে সামনে এসেছিল বাঙালি মুসলমানের কথ্যভাষা বাংলা, ধর্মের ভাষা আরবী, ভাতৃত্বের ভাষা উর্দু- এর মধ্যে কোনটি বেশি জোরালো। অতএব ১৯৭১ খ্রি. পর বাঙালি মুসলমান সমাজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধর্মীয় দাপটের কাছে ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। যার প্রত্যক্ষ পরিণাম স্বরূপ বাংলাদেশে ৫ই জুলাই ২০২৪ এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাঙালী মুসলমানের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো ধর্মনিরপেক্ষতার যাত্রা অক্ষুণ্ন রাখার লড়াই অনন্ত এবং অসম্ভব মনে হলেও সত্যি।

সূত্রনির্দেশ

১. সুশোভন সরকার, ‘বাংলার রেনেসাঁস’, কলকাতা,দ্বীপায়ন,কার্ত্তিক ১৩৬৭,পৃ. ১০
২.North Bengal University,pdf, https://ir.nbu.ac.in ,‘উনিশ শতকে নবজাগরণ ও বাঙালি মুসলমান সমাজ’ পৃ.৯-১৬
৩. SHAHADAT H. KHAN, ‘Radicalism in Bengali Muslim Thought: Kazi Abdul Wadud and the ‘Religion Of Creativity’, cited in Rafiuddin Ahmed(editor), ‘Understanding the Bengal Muslim’,New Delhi,oxford university press,2001,p. 153
৪. ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, ‘কালের কন্ঠ’(ই-পেপার)১২ই এপ্রিল২০২০,পৃ. ৮
৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর’,ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,হিমায়ৎ নগর,হায়দ্রাবাদ,২০২১ পৃ. ৪০৩
৬. তদেব, পৃ. ৪০৩
৭. অধীর বিশ্বাস(সম্পাদিত) আজকের গাংচিল পত্রিকা ‘মুক্তিযুদ্ধ’,দ্বিতীয় বর্ষ(অক্টোবর -জানুয়ারি ২০২২)পঞ্চম সংখ্যায় প্রাপ্ত, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘মুক্তিযুদ্ধ ও আজও যাঁরা দেশভিকারি’,পৃ.১৭৬-১৭৭
৮. প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ. ৫১
৯. প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ.৩৩২
১০.প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ.১৩২-১৩৩,১৮৩
১১.বদরুদ্দিন উমর, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালিন রাজনীতি’,ঢাকা
১৯৭৯,প্রথম খণ্ড,দ্বিতীয় সংস্করণ ,পৃ. ১৭-১৯
১২. আশীষ কুমার দাস, ‘স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানে (১৯৭১)ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা’ যা উল্লিখিত রয়েছে সুস্নাত দাশ(সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ(১ উডবার্ন পার্ক কলকাতা ৭০০০১২)২০০৭,‘ইতিহাস অনুসন্ধান-২১’ পৃ. ৯৮২
১৩.তদেব পৃ.৯৮৪
১৪.প্রাগুক্ত ‘গাংচিল’ পৃ.১৩৪
১৫.প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ.৫৬
১৬.প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ.৫৮
১৭. মইদুল হাসান, ‘মূলধারা ৭১’ঢাকা,১৯৮৬ পৃ.৬,উল্লেখ রয়েছে প্রাগুক্ত, ইতিহাস অনুসন্ধান-২১, পৃ. ৯৮০
১৮. G.P.BHATTACHARJEE, ‘Renaissance and freedom movement in Bangladesh’,Minerva Associates(publication)1973, page no- 250
১৯.প্রাগুক্ত, ‘গাঙচিল’ পৃ. ২০৬

২০.প্রাগুক্ত,'গাঙচিল' পৃ. ২০৬-২০৭
২১.প্রাগুক্ত, 'গাঙচিল' পৃ. ২০৭
২২. প্রাগুক্ত, 'গাঙচিল' পৃ. ৩৬০
২৩. প্রাগুক্ত, 'গাঙচিল' পৃ. ১৭৬
২৪. Wikipedia,'মুজিব হত্যাকাণ্ড'
২৫.এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, (ঢাকাঃ ইউপিএল,১৯৯৩)পৃ.২৭৩-২৭৪ যা উল্লেখ রয়েছে আবুল কাশেম, 'আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি',অনিরুদ্ধ রায়(সম্পাদক)পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস
সংসদ(১উডবার্নপার্ক কলকাতা ৭০০০১২)২০০৫,'ইতিহাসঅনুসন্ধান-১৯' পৃ.৯০৩
২৬.প্রাগুক্ত,এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, পৃ ২৭৫,প্রাগুক্ত'ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯' পৃ.৯০৩
২৭.প্রাগুক্ত,'ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯' পৃ.৯০৩
২৮.বর্তমান বাংলাদেশের সরকারি আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

কৃতজ্ঞতা : এই পেপারটির কাঠামো গঠনে সাহায্য করেছেন ড.পাপিয়া দত্ত, এসোসিয়েট প্রফেসর,রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা,হুগলী।